গৌরী ভট্টাচার্য

নিঃসঙ্গ পরিব্রাজক

হাইকোর্টের সিল করা তালা দেওয়া ছিল ৮নং চণ্ডী ঘোষ লেনের ফ্ল্যাটে। বম্বে থেকে দাদাকে নিয়ে এসেছিলাম সদ্য ভাঙা-পা অপারেশনের পর। ভেতরে স্টিল প্লেট লাগানো, হাঁটাচলা করতে যতদিন সময় লাগে আমার বাসায় থাকার ব্যবস্থা করেছিলাম। পশ্চিমবঙ্গের জোলো আবহাওয়া দাদার সহ্য হল না। ক্লনিক ইউসোনোফেলিয়া, ব্রঙ্কিয়াল অ্যাজমা ইত্যাদি নানারকম আনুষঙ্গিক রোগের দ্রুত বৃদ্ধি হতে লাগল। খুব জিদ ছিল। হোমিওপ্যাথি চিকিৎসা চলতে লাগল। এতে শেষকালে মাত্র ২ মাসের মধ্যে দাদা একেবারে দারুণ রকম কাহিল হয়ে পড়ল। হাঁপের টান উঠলে, সারাদিনরাত বালিস নিয়ে বসে থাকত। বহু অনুনয় বিনয় করে কোনমতে রাজি করানো হল অ্যালোপাথি চিকিৎসার। ডাক্তার কামাক্ষ্যা মুখার্জি এই তল্লাটের খুব নাম করা ডাক্তার। বয়স্ক ডাক্তার, অভিজ্ঞ। তাঁর চিকিৎসায় খুব তাড়াতাড়ি ভাল করে তুললেন দাদাকে। ফিজিও-থেরাপিস্ট ঠিক করা হল। বাড়িতে রোজ সন্ধ্যাবেলায় দু ঘণ্টা ধরে দাদার পায়ে মাসাজ হত। একটু একটু করে দাদা আবার নিজের পায়ে দাঁড়াল। এক পা এক পা করে ঘরের একধার থেকে দেয়াল পর্যন্ত হেঁটে গেল, এল। সন্ধে হলেই বাড়িতে আনন্দের বন্যা বয়ে যেত। দাদার পা এবার সেরে যাবে, স্বাভাবিক চলাফেরা করবে। টালিগঞ্জের ফ্ল্যাটে যাওয়ার জন্যে হুইল চেয়ার কিনতে দিল না, বলল আর ২/১ মাসে পা ঠিক হয়ে যাবে। রোজ সন্ধেবেলা ডাক্তার চলে যাবার পর দাদার গল্পের আসর বসত। আজ আপশোস হয়, তখন যদি ওর সব কথা টেপ করে রাখতাম। এখানে থাকাকালীন একটা ফটোও তুলিনি, সব কাঁদন পরে হবে এই আশায় স্থগিত ছিল। এই আনন্দের আসরে হঠাৎ আমার বড়বোন, তার স্বামী ও ছেলের আসা যাওয়া শুরু হল। তাঁরা খুব ধনীলোক। আমার সামান্য ঘরে দাদার থাকা নিয়ে তাঁদের প্রচণ্ড আপত্তি উঠল "এসব ঘরে গোরু ছাগল থাকে", তুমি আমাদের ওখানে চল। দাদার উত্তর হল— "আমি গরু ছাগলের দাদা—, গরু ছাগলের সঙ্গেই থাকবো।" বড়লোক জামাইবাবু— তাঁর ইচ্ছে নামকরা বড় বড় ডাক্তার ডাকা হোক, নানান্ তর্কাতর্কি চলতে থাকল কাঁদন ধরে। দাদা যেন থেকে পড়ত। শেষপর্যন্ত ডাঃ কামাক্ষ্যা মুখার্জী বাতিল হয়ে গেলেন। আশ্চর্যের বিষয় এই যে কোন বড় ডাক্তার কিন্তু দাদার চিকিৎসার জন্যে এলো না। জামাইবাবুদের বাড়ির হাউস ফিজিশিয়ান একজন ছোকরা ডাক্তার তিন দিনে দাদার শরীর ভাল করে দেবার দায়িত্ব নিয়ে দাদার চিকিৎসা করতে এলেন, রক্ত ইত্যাদি সব দুবার করে পরীক্ষা হল, সত্যিই তিনদিনে এমন অবস্থা হল দাদার, এমন বেড়ে গেল নিঃশ্বাসের কষ্ট, যে সেই ছোকরা ডাক্তার সুলেমান তাড়াতাড়ি, পি জি-তে ভর্তি করার ব্যবস্থা করতে উপদেশ দিয়ে কেটে পড়লেন। ততক্ষণে দাদার খাওয়া দাওয়া প্রায় বন্ধ হয়ে গেল। পা দুটো

ভীষণভাবে ফুলে গেল, নিঃশ্বাসের কষ্টে অস্থির হয়ে ছটফট করতে লাগল। অথৈ জলে পড়লাম আমি। কাছাকাছি রামকৃষ্ণ সেবাসদনের ইমার্জেন্সীতে ভর্তি করা হল। সাতদিন ধরে যমে মানুষে টানাটানি চলল। ক্রমশ অবস্থার আরো অবনতি হল। কিছুতেই কিছু হল না। ১৩ নভেম্বর ভোররাতে দাদা আমায় ছেড়ে চলে গেল, আমার চোখের সামনে অত বড় একটা প্রতিভার জীবনদীপ নিভে গেল।

এরপরেও একলা দাঁড়িয়ে ৮নং চন্ডী ঘোষের বাড়ি, আংধেরীর বাড়ির মতো করে দাদার সব জিনিসপত্র, ছবি কাঠপুতলি লেখা বই দিয়ে গুছিয়ে রেখেছিলাম। দেশ বিদেশের অনেকজন ওই বাড়িতে এসে নীরবে চোখের জল ফেলে গেছেন শোকাপ্লুত অবস্থায় অসীম শ্রদ্ধা জানিয়ে গেছেন দাদার স্মৃতির উদ্দেশে। আমায় বুকভরা সমবেদনা জানিয়ে গেছেন। স্মৃতি সভা হয়েছে প্রথম যোগেশ মাইম একাডেমিতে। দাদার সব কিছুর সম্পূর্ণ দায়দায়িত্ব সম্মিলিতভাবে আমার ওপর ন্যস্ত হয়েছে। দ্বিতীয়বার দাদার ছবির প্রদর্শনী হয়েছে কলকাতা তথ্য কেন্দ্রে। এই প্রদর্শনী চলাকালেই ১৯৮০ সালে হঠাৎ মামলার সূত্রপাত করল আমার বড়বোন। দাদার ছবির দাবিতে পার্টিশানের মামলা। আমার কাছ থেকে সব ছবি, লেখা বইয়ের অধিকার কেড়ে নিয়ে ঐ চন্ডী ঘোষ রোডের বাড়ি হাইকোর্ট থেকে সিল করে দেওয়া হল। যতদিন না মামলার নিষ্পত্তি হয়, দাদার সৃষ্টি ও বই লেখা ইত্যাদি বিষয়ে একটি আঙুল নাড়ার অধিকারও আমার কাছ থেকে কেড়ে নেওয়া হল।

সম্পূর্ণ অন্ধকারে ডুবে গেল, সব পরিকল্পনা উদ্যম ও উৎসাহ। দশবছর পরে নিষ্পত্তি হয়েছে মামলার। দাদার করে যাওয়া উইলের জয় হল। ৮নং চন্ডী ঘোষের বাড়ির মালিক ইতিমধ্যে বাড়িছাড়ার মামলা দায়ের করেছিলেন আমার বিরুদ্ধে। মামলার নিষ্পত্তির খবর আমি জানতে পাবার আগেই তাঁরা আলিপুর কোর্টের বেলিফকে দিয়ে ঘরের তালা ভেঙে দাদার সব জিনিসপত্র বার করে দিলেন। ঘরে নিজেদের তালা দিয়ে দিলেন। সমস্ত জিনিসপত্র বই ছবি, দশবছর ওই একতলার ফ্ল্যাটের ঘরগুলিতে বন্ধ থাকায় শতকরা ৫০ ভাগ পোকামাকড় ইঁদুর ও ড্যাম্পের কারণে নষ্ট হয়ে গেছিল। তার ওপর যথেচ্ছ টানা-হেঁচড়া ও লন্ডভন্ড হয়ে তার বাকিটুকুও তছনছ হয়ে গেল। উদ্ধার করার মতো বিশেষ কিছু ছিল না তবু দৈবক্রমে যা কিছু গুছিয়ে নিয়ে নেতাজী নগরের আদর্শ পল্লীর একটি ঘরে তোলা হল তার মধ্যে দৈবক্রমে দাদার কিছু ছবি ও পাঁচ হাজার বইয়ের মধ্যে পোকাকাটা অবস্থায় হাজারখানেক বইয়ের হদিশ পাওয়া যায়।

এই ধ্বংস স্তূপের মধ্যে পাওয়া গেছে ভিজে দোমড়ানো মোচড়ানো একটি চামড়ার ব্যাগ। ঐ ব্যাগটি আমার বিশেষ পরিচিত। আমার মনে পড়ে গেল এই ব্যাগটি আর একটি জলের বোতল ছিল ১৯৩৯ সাল থেকে দাদার নিত্যসঙ্গী। এই ব্যাগটি কাঁধে ঝুলিয়ে আর এই এক বোতল জলের সংস্থান নিয়ে দাদা সারা ভারতের আনাচে কানাচে, গ্রামে-গ্রামান্তরে ঘুরে বেড়াত। ব্যাগে থাকত দাদার ছবি আঁকার সরঞ্জাম, স্কেচ খাতা,

নোটবই আর সিগারেটের প্যাকেট। চট্টগ্রামের বন্যা ও দুর্ভিক্ষ কবলিত গ্রাম, বন, জঙ্গল, মিলিটারির অত্যাচারে শ্মশান হয়ে যাওয়া পল্লী ও তার নিঃস্ব অনাহার ক্লিষ্ট অধিবাসীদের ছবি আঁকতে আঁকতে সারা পূর্ববাংলা পায়ে হেঁটে ঘুরে বেড়াচ্ছে দাদা— তখনকার কত মানুষ দেখেছেন সেই দৃশ্য। মোটা খদ্দরের হলদে পাঞ্জাবি ও পায়জামা পরা চিত্ত প্রসাদের কাঁধে এই এক ব্যাগ। ধলঘাট রাঙামাটির কিষান মজদুর সভায় এসেছিলেন তিনি পি. সি. যোশি— তৎকালীন সর্বভারতীয় সি. পি. আই এর প্রধান নেতা। তিনিও চিত্ত প্রসাদের সেই মূর্তি দেখেছেন, হাজার হাজার পোস্টার এঁকে চলেছেন বলিষ্ঠ রেখায়। গ্রাম থেকে গ্রামান্তরে শহর থেকে শহরে গণজাগরণের উত্তাল জোয়ার এনেছিলেন চিত্ত প্রসাদ ছবির ভাষার উদাত্ত আহ্বানে গণ সংগঠনের এই প্রথম হোতাকে দেখে, তার সত্যদৃষ্টি, ছবির বিষয় নির্বাচন, সাদাকালো তুলির টানে সেই সত্যের প্রচণ্ড প্রকাশ শক্তি ও ক্ষমতা দেখে বিস্ময়ে হতবাক হয়ে গেছিলেন পি. সি. যোশি। জোর করে দাদাকে তিনি কলকাতার মূল অফিসে নিয়ে আসেন, দায়িত্ব দেন কলকাতায় আসন্ন পার্টি মহাসম্মেলনের মণ্ডপসজ্জার। সেখানেও এই ব্যাগ কাঁধে দাদা দিবারাত্রি পরিশ্রমে প্রায় চার হাজার পোস্টার দিয়ে ভরিয়ে দিয়েছিলেন। তারপর পি. সি. যোশির ডাকে দাদাকে যেতে হল বম্বে। প্রায় দুবছর পার্টির কাজে দাদাকে থাকতে হয়েছিল কলকাতায়। এখানে কাজ ছিল কিন্তু তার জন্যে ছিল না কোন আয়। প্রায় অনশনে অর্ধাশনে দিন কাটত ১০নং শ্যামাচরণ দে স্ট্রিটের তিনতলার একটি খুপরি ঘরে। এ সময়ের দিনপঞ্জির ইতিবৃত্ত জানেন 'কথাশিল্পের' অবনী রায় মশাই*। এ সময় হঠাৎ দাদার আলাপ হয়েছিল বীরেন্দ্রকৃষ্ণ ভদ্রের সঙ্গে। চাঁটগাঁর আর্যসঙ্গীত সমিতির প্রতিষ্ঠাতা সুরেন্দ্রলাল দাসের সঙ্গে অত্যন্ত প্রীতির সম্পর্ক ছিল দাদার। তিনি তখন অল ইন্ডিয়া রেডিওর মিউজিক ডিরেক্টর। তাঁর ও বীরেন্দ্রকৃষ্ণের সুপারিশে দাদা কলকাতা বেতারে 'বেতারজগৎ' পত্রিকার অলংকরণের কাজ পান। বিখ্যাত 'মহিষাসুরমর্দিনী' অনুষ্ঠানের প্রথম প্রচার যখন হয়েছিল, সেই নিয়ে দাদার আঁকা 'মহিষাসুরমর্দিনীর' একটি ছবি 'বেতারজগৎ'-এ প্রকাশিত হয়। ছবিটি আজও অক্ষত আছে। তখনও দাদার সঙ্গে থাকত এই চিরপুরাতন ব্যাগটি।

এর পর ৪২ সালের মন্বন্তর। এই ভয়ানক সংবাদ বেতার মারফৎ তখন রোজই প্রচারিত হত। মেদিনীপুরের অবস্থা মায়ের চিঠিতে দাদা জানতে পারে। বাবা তখন রিটায়ার করেছেন। তাঁকে সিভিলসাপ্লাইয়ের চিফ ইন্সপেক্টর করে পুনর্নিযুক্তি ও বহাল করা হয়। আমাদের এবং মেদিনীপুর শহরের শতকরা পঞ্চাশটি পরিবারের তখন চরম দুর্দশা ও খাদ্যাভাব। গোপনে যারা খাদ্য বা চাল সংগ্রহ করতে পারত, তারা ছাড়া কারো সপ্তাহে দুবার ভাত জুটত না। মিলিটারির কল্যাণে গমের বস্তা

* অবনীবাবুর সঙ্গে যোগাযোগ করা হয়েছিল। গৌরী দেবী সম্ভবত ঠিক জানেন না। অবনীবাবু জানান, 'চিত্ত প্রসাদকে আমি বোম্বাইয়ে কাছ থেকে অনেকদিন দেখেছি, মিলেছি'।

দেখেছিলাম সেই প্রথম আমরা। পরিবার পিছু সপ্তাহে দু সের করে গম দেওয়া হত। গ্রামের দিকে মানুষ আটার ব্যবহার জানত না, চালের মতো করে গমসেদ্ধ করে ওদের ভাতের অভাব পূর্ণ করতে আমিও দেখেছি। আমি তখন স্কুলের ছাত্রী। মনে আছে খাবার জন্যে বাজারে কোনো তরকারি পাওয়া যেত না। খালবিল শুকিয়ে যাওয়ায় মাছ পাওয়া যেত না। গবাদি পশু মরে যাওয়ায় দুধে খাইনি আমরা কতকাল। অ্যামেরিকান গুঁড়োদুধ টিনে করে স্কুলে আসত। ওই জলে গুলে দিত আমাদের। কেউ খেতে পারত না। মেদিনীপুরে আমরা যে বাড়িটায় থাকতাম তাতে একটা গভীর কুয়া ছিল। একেবারে যেন পাতালে চলে গেছিল জল। তাই টেনে-টেনে ছোড়দা আর মা বাড়িতে শাকপাতা রাঙালুর গাছ করেছিলেন। খুব পাথুরে আর কাঁকুরে মাটি। কিছু জন্মাত না আর। মনে আছে সজনে শাক, তেলাকুচো পাতা এসব দিয়ে একটা কিছু রান্না হত আর শুকনো রুটি। বাবা এ বিষয়ে একেবারে নির্বিকার ছিলেন। আসলে বাবা ছিলেন অত্যন্ত সাচ্চা ও সৎপ্রকৃতির ব্রাহ্মণ। খুব ধর্মে বিশ্বাস ছিল। রোজ মহেন্দ্রক্ষণে উঠে গায়ত্রী জপ করতেন। শাদা উপবীতটিকে বাবা অনুশাসনের মতো মান্য করে চলতেন। নইলে সে সময় তিনি যে সুবিধেজনক পরিস্থিতিতে কাজ করতেন, সামান্য অসাধুতার আশ্রয় নিলে অন্তত আমাদের খাওয়া পরার কোনো কষ্ট পেতে হত না। মেদিনীপুরের ওই বাড়িটি বাড়িওলা ঈশ্বরচন্দ্র পাঁড়ত মাত্র দুহাজার টাকায় বাবাকে বিক্রি করে দিতে চেয়েছিলেন। সেদিন যদি বাড়িটি কিনে নিতেন তাহলে বাবার মৃত্যুর পর আমাদের বাড়ি ছাড়া করার জন্যে ঈশ্বরবাবুর ছোট ছেলে প্রভাত, আমার মাকে অতর্কিতে মাথা ফাটিয়ে দিতে পারত না। কিম্বা মায়ের মৃত্যুর পর, ওবাড়িতে আমার অনুপস্থিতির সুযোগ নিয়ে, সাজানো সংসার, সমস্ত জিনিসপত্র, জীবজন্তু মায় মায়ের ঠাকুর কুলদেবতা পর্যন্ত সমেত বাড়িটি বেআইনি ভাবে দখল করতে পারত না। ওই বাড়িতে দাদার অজস্র ছবি, বই-এর পাণ্ডুলিপি, মায়ের অজস্র কবিতা, বাবার দুষ্প্রাপ্য সংস্কৃত বইয়ের বিশাল সংগ্রহ, গানবাজনার বহু যন্ত্র ও মার্গসঙ্গীতের কয়েকশত বই পুরনো দিনের আসবাবপত্র এবং অজস্র স্মৃতিচিহ্ন ছিল। সেইসব সমেত বাড়িটি বে-দখল করে ১৯৭২ সালে। আমি তখন দাদাকে দেখতে বম্বে গিয়েছিলাম। বাড়ি আর উদ্ধার হয়নি কোনো জিনিসও নয়।

ওই বাড়িটিতে আমাদের বহু স্মৃতি বিজড়িত ঠিকানা ছিল জাজেস কোর্ট রোডে। আগেকার কত ঘটনা, কত স্মৃতি তো অহরহ মনে পড়ে। মনে পড়ে মন্বন্তরের ওই হাহাকারের দিনে একদিন সন্ধ্যার সময় বাইরের ঘরে বসে বাবা অফিসের কাগজপত্র দেখছিলেন। আমাদের কিছু কখনও বলতেন না কিন্তু অসাধু প্রস্তাব সে সময় বাবার কাছে অহরহ আসত যে তার প্রমাণ একদিন পাওয়া গেল। মেদিনীপুর জেলার জন্য যত খাদ্য ও বস্ত্র সাপ্লাই সরকার থেকে সদরে পাঠান হত সব কিছু বিতরণের প্রধান কর্তা ছিলেন বাবা। কাজেই বাবাকে প্রলোভন দেখিয়ে, ঘুষ দিয়ে তখনকার মেদিনীপুরের বড় বড় ব্যবসায়ীরা কিছু সুবিধের চেষ্টা সমানে চালিয়ে যাচ্ছিল। দাদার দুর্দান্ত ব্যক্তিত্ব

সম্পূর্ণত বাবার কাছ থেকেই পাওয়া। এই ব্যক্তিত্ব তাঁর ধবধবে পৈতেটির মতো মনের ভেতরটাকেও পরিচ্ছন্ন করে রাখত। সেদিন সন্ধ্যায় বাড়ির সামনে দুটি ঘোড়ার গাড়ি বোঝাই করে, ঝুড়িঝুড়ি ফলমূল, খড়গপুর থেকে আনা সবজি, বারকোশের মতো ডালা ভরা মিষ্টি, ভাদুয়া ঘিয়ের টিন ও বড় বড় বাক্সতে কাপড় নিয়ে একজন মাড়োয়ারি বস্ত্র ব্যবসায়ী বাবার কাছে আসেন। প্রথমটা আমরা অর্থাৎ ছোড়দা, ছোড়দি ও আমি, বাবার গলায় ধমক আর চেঁচানো শুনে অবাক হয়ে গেছিলাম। বাবাকে কখনও এত রেগে যেতে দেখেনি কেউ। এ দিকে খুব ঠান্ডা মানুষ ছিলেন। বাবার কাছে বকা বা মারধোর আমরা কল্পনাই করতে পারি না। সেই মানুষকে ওরকম চেঁচামেচি করতে দেখে পর্দার ফাঁক দিয়ে আমিই প্রথম উঁকিঝুঁকি মেরে দেখি বাবার টেবিলে কত কত নোটের তাড়া। আমি খবরটা ছোড়দা ও ছোড়দিকে দিতে ওরাও পর্দার পেছনে এসে জড়ো হল। বাবা বলছিলেন, 'এখনি বেরিয়ে যাও নইলে আমি পুলিশে রিপোর্ট করব, ভেবেছ কি, দেশের লোকের জিনিস নিয়ে তুমি জোচ্চুরি করতে চাও, আমায় ঘুষ দিতে এসেছ রাতের অন্ধকারে? এক্ষুনি সব ওঠাও, সব লাথিয়ে ফেলে দেব।' তারপর খানিকটা ঠেলাঠেলি আর মাড়োয়ারি ব্যবসায়ীর ভাঙা বাংলাতে অনুরোধ উপরোধ 'নেই, নেই, চারুবাবু, ঘুষ নেই আপনার ছেলেমেয়েদের জন্যে এনেছি। কিছু পাওয়া যাচ্ছে না বাজারে, ওরা খাবে পরবে। চারুবাবু আপনি চটবেন না সেহি ভাবে আমি আপনি, আপনি শুধু হমার লাইসেন্সটা করিয়ে দিবেন, চারুবাবু, হামি আপনার দাস হয়ে থাকছি।···' বাবার পায়ে ধরতে যাচ্ছে। বাবা অমনি ওর ঘাড় ধরে এক ধাক্কাতে দরজার থেকে ঠেলে বাইরে বার করে দিলেন। এলোপাথাড়ি ফল তরকারি ছুঁড়ে ফেলে দিলেন মাঠে। বাইরে একটু মাঠ ছিল, উঠোনের মতো তারপর রাস্তা। নোটের বান্ডিল-গুলো মাঠে ছুঁড়ে ফেলে দিলেন অন্ধকারে, তারপর দরজা বন্ধ করে আবার চেয়ার টেনে বসলেন কাজে, আমরা দেখলাম, রাগে, অপমানে, দুঃখে বাবা একেবারে থরথর করে কাঁপছেন, লাল হয়ে গেছে মুখচোখ। ভয়ে ভয়ে আমরাও তাড়াতাড়ি যে যার জায়গায় পালিয়ে গেলাম।

এই ঘটনার তিন চারদিন পরে হঠাৎ দাদা সন্ধের লোকালে এসে পৌঁছল। কাঁধে সেই ব্যাগ। হাতে একটা ছোট চামড়ার স্যুটকেস। ভেতরের বারান্দায় ঢুকে আমাদের দেখে বলল 'কিগো; কেমন আছ, কী করছ তোমরা সব—?' ব্যাস্ তার পরে মায়ের ঘরে। অনেক রাত পর্যন্ত মার যত কথা ছিল আর দাদার যত কথা ছিল, যথাসম্ভব বলা হলে, তারপর দাদার খাওয়া দাওয়া জামাকাপড় ছাড়া শোওয়ার ব্যবস্থা। দাদা আমাদের খুব ভালবাসত, প্রত্যেকের জন্যে নাম করে করে যত সামান্যই হোক, একটু কিছু হাতে করে নিয়ে আসত। সকালবেলায় দাদার স্যুটকেস খোলার ব্যাপারটা আমাদের যে কি উৎসাহের বিষয় ছিল বলার নয়। কিন্তু এবারে দাদাকে খুব বিষণ্ণ আর চিন্তিত দেখে আমরাও কেমন দমে গেলাম। শুতে শুতে সেদিন অনেক রাত হয়ে গেছিল। মা আর দাদার মধ্যে

অনেক কথা হল রাত পর্যন্ত। কখন তার পর ঘুমিয়ে পড়েছিলাম, মনে নেই। ঘুম ভাঙল, ভোর না হতেই বুকের মধ্যে গুরগুর করে উঠল 'দাদা এসেছে!' 'দাদা এসেছে!' বিছানায় বসেই দেখলাম, দাদার খাট খালি। কখন উঠে পড়েছে, কি জানি। এ ঘর ওঘর করে দেখলাম, দাদা বাড়িতে নেই। মা মাঠের দিকে চেয়ে, জানলায়-বসে। দাদার সেই ব্যাগটা নেই। বুঝলাম অনেক ভোরে ব্যাগ নিয়ে দাদা কোথায় বেরিয়েছে। বেলা হল, দাদা ফিরছে না সমানে উসখুস করছি। মাকে কিছু জিগ্যেস করার সাহস নেই কারো। এক সময় মা নিজেই বললেন 'ডবি কাঁথি গেছে, গ্রামের অবস্থা দেখতে।' সারাদিন কাটল সন্ধে পার হয়ে রাত হয়ে গেল দাদা ফিরল না। আমরা মায়ের কথামত খেয়ে দেয়ে শুয়ে পড়লাম। বাগানের ঝিঙের চচ্চড়ি আর রুটি রোজ রোজ ইচ্ছে করত না খেতে তবু বাধ্যতা আর হাসিমুখ আমাদের সব অভাবকে মানিয়ে নিতে সাহায্য করেছিল। মনে পড়ে না কোনো দিন ওই দুর্ভিক্ষের সময় আমরা কেউ, বাবা পর্যন্ত, কখনও কোনো বিতৃষ্ণা বা বিরক্তি প্রকাশ করেনি। 'দেশে খুব আকাল চলছে, ঘরে ঘরে লোক অনাহারে আছে। গ্রামের দিকে হাজার হাজার লোক মারা গেছে, এখনও যাচ্ছে।' বাবার এই কথাগুলো মনে করে রোজ খাবার সময় হলে আমাদের নিজেদের কি রকম অপরাধী মনে হত। এই ভাবটা কিছুতেই কেউ কাটিয়ে উঠতে পারতাম না। দাদা ফিরত অনেক রাতে। পরিশ্রান্ত, উস্কোখুস্কো চুল, ময়লা ধুলোভরা জামা চটি। ঘণ্টার পর ঘণ্টা মায়ের ঘরে বসে বলত সারাদিনে যা দেখেছে যা শুনেছে যা জেনেছে তার মর্মান্তিক কাহিনী, ব্যাগ থেকে বার করত খাতা, কাগজ ওতে অজস্র ছবি আঁকা। গ্রাম গ্রামান্তরে হেঁটেহেঁটে লিখে আনা ঘটনা, এঁকে আনা ছবি একে একে দেখাত মাকে, পড়তে পড়তে গলা ধরে যেত দাদার, আর মা কাঁদতেন ছবি দেখে আর ঘটনা শুনে। প্রতি রাত্রে এই ঘটনার পুনরাবৃত্তি হত, প্রায় একমাস ধরে। মা আর দাদা শুধু শেষ রাতটুকু বিশ্রাম করতেন, আবার ভোর হলে দাদা বেরিয়ে যেত। আগে দেখতাম দাদার সারাদিনের খাবার বলতে একটুখানি চিড়ে আর গুড় বেঁধে গুছিয়ে রাখতেন বিকেল থেকে। দাদা নিয়ে যেত কিন্তু খেতে পারত না, কাউকে দিয়ে দিত। তাই মা ক্রমশ বেশি করে চিড়ে-গুড় বেঁধে দিতেন বড় ব্যাগে। কাঁধে ছবির ব্যাগ হাতে চিড়ে-গুড়ের ব্যাগ বয়ে নিয়ে কোথায় কোথায় চলে যেত দাদা। ওই একমাসে দাদা রোগা হয়ে, রোদে পুড়ে কালো হয়ে গেছিল এমন যে চেনাই যেত না। সবকিছু বিশদ বুঝতাম না। তখন দুর্ভিক্ষের জন্যে গ্রামের পর গ্রাম ছারখার হয়ে গেছে, শ্মশান হয়ে গেছে, কত লোক ঘরের দাওয়ায় মরে পড়ে থেকেছে, তার কিছু কিছু বর্ণনা শুনতে পেতাম। বড় কষ্ট হত দাদাকে কাঁদতে দেখে। যাও-বা খাবার জোগাড় করে দিতেন মা, আমাদের মুখে উঠত না। বাবা কোথা থেকে থলে করে খুদ নিয়ে আসতেন ২।১ দিন ছাড়া ছাড়া। সেই খুদ ফুটিয়ে নুন দিয়ে বিতরণ করতেন মা, দুপুরবেলা সামনের উঠোনে কতো অনাহার ক্লিষ্ট কত যে মানুষ আসত, টিনে করে তারা ওই খুদসেদ্ধ খেত রোজ। ওরা বলত ওরা কেউ 'ভিখিরি' ছিল না।

মেদিনীপুরের নানান গ্রাম থেকে আসা গরিব চাষী ছিল ওরা। গ্রামদেশে জমির মাটি ফেটে গেছে, কোথাও সমুদ্রের নোনা জলের বন্যা জমি নষ্ট করে দিয়েছে, বাড়ি ঘরদোর ভাসিয়ে দিয়ে গেছে। শুধু দুটি খাবার আশায় শহরের দিকে চলে এসেছিল ওরা। পথে পথে কেঁদে বেড়াত, 'ফ্যান দাও মা, এটু ফ্যান' ক্রমশ ক্রমশ এই হাহাকার আরও আরও বাড়তে লাগল। দিনেরাতে আমরা চারদিকে মানুষের কান্না শুনতে পেতাম। বাজারে, পথের ধারে, মাঠের মধ্যে মরে পড়ে থাকত ওইসব নিরন্ন মানুষ। ততদিনে দাদা ফিরে গেছে বম্বেতে। যাবার দিনে আমাদের সবাইকে একে একে বুকের মধ্যে জড়িয়ে ধরে দাদা ফোঁপাচ্ছিল আর বলে গেছিল, 'কোনমতে বেঁচে থাকিস তোরা, মা বাবাকে বাঁচিয়ে রাখিস। বেশিদিন এরকম আর চলবে না, দুনিয়ার লোকে ধিক্কার দিচ্ছে।' ছোড়দা হয়ত এ কথার মানে তখন বুঝেছিল, আমরা দুইবোনে কিছু বুঝিনি কে, কাকে, কেন ধিক্কার দিচ্ছে, কার কোন অন্যায় অযোগ্যতার জন্যে গ্রামবাংলা শ্মশান হয়ে গেল, কার পাপে এত লক্ষ লোক অনাহারে মারা গেল।

মনে আছে আমি তখন মিশন বালিকা বিদ্যালয়ে পড়তাম, স্কুলের পক্ষ থেকে ত্রাণ সমিতি হয়ে মেদিনীপুরের পথে পথে বাড়ি বাড়ি ঘুরে অনেক টাকাপয়সা চাল কাপড় সংগ্রহ করেছিলাম ছাত্রীরা মিলে। সে সময় চারদিকে সাড়া পড়ে গেছিল সাহায্য তহবিল খোলার। সব স্কুল, মেদিনীপুর কলেজ, কলেজিয়েট স্কুল, সবাই চাল ও কাপড় সংগ্রহ করে, জেলাশাসকের দপ্তরে জমা দিতে লাগল। পত্রপত্রিকায় ছাপা হতে লাগল দৈনন্দিন ঘটনার বিবরণ দিয়ে। এর কিছুকাল পরে মায়ের কাছে একটি পার্সেল এল বম্বে থেকে। মা দেখালেন বাবাকে, আমাদের সবাইকে দাদার বই! দাদার সেই একমাস ধরে প্রত্যক্ষ-দর্শীর বিবরণ লেখা ও আঁকা 'Hungry Bengal'।

মায়ের কাছে পাঠানো ওই একখানি কাঁপাই বোধহয় আজ সেই বিভীষিকার সাক্ষী হয়ে আছে। শুনেছি বইটির পাঁচ হাজার কপি বৃটিশ রোষে পুড়িয়ে ফেলা হয়েছে। আজ বুঝতে পারি শাসককুলের চরম গাফিলতির কলঙ্ক চাপা দেয়ার প্রচেষ্টায় এছাড়া বোধহয় আর কোন পথই ছিল না কেননা 'Hungry Bengal' একটি অতি গুরুত্ব-পূর্ণ ঐতিহাসিক দলিল। সরেজমিন তদন্তের Report। এমনভাবে জীবন বিপন্ন করে প্রত্যক্ষদর্শীর তথ্য সংগ্রহ করার প্রচেষ্টা ও তার দৃষ্টান্ত সম্ভবত আর নেই। 'Hungry Bengal' চিত্ত প্রসাদের একটি অসামান্য সৃষ্টি। প্রায় পঞ্চাশ বছর (৪৮ বছর) পরে আবার সেই লেখা 'যোগসূত্র' ছাপল। □